প্রণয়প্রাণিত দ্বিজেন্দ্রলাল

সন্দীপ মুখোপাধ্যায়

দিলীপকুমার রায় দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কিত বইটির নাম দিয়েছিলেন 'উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল'। দ্বিজেন্দ্রলালের কবি স্বভাবেব সঙ্গে বিশেষণটি কতদূর মানিয়ে যায় সেটি ব্যাখা করে পুত্র লিখেছেন– ''উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল' -এ আমি লিখেছি; তাঁর অন্তরটা ছিল উদাসী। কিন্তু এ- উদাসীর অন্তরাটা ছিল গোপন-সঞ্চারী, মাঝে মাঝে যেন খানিকটা অন্যমনস্ক হয়েই নিজের গহন অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে আসত বটে, কিন্তু ক্ষণিকের জন্য– তারপরেই পাছে কেউ দেখে ফেলে এই ভয়ে ঝটিতি হত পরদানসিন।"[১]

দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যতম প্রামাণ্য জীবন – দেবকুমার রায়চৌধুরী-র 'দ্বিজেন্দ্রলাল' পড়ে তাঁর মজলিশি, স্পষ্ট, স্বচ্ছ ও অকপট মনটিকে চিনতে পারা যায়। আবার তাঁর অল্পকিছু প্রেমের গান –যেগুলি 'আর্য্যগাথা'য় পাওয়া যায়– তাঁর নিভৃতচারী সত্তাটিকে চিনিয়ে দেয়। তাঁর এই দু ধরণের মেজাজ নি দেবকুমার স্মৃতিনির্ভর বিস্তৃত আলোচনা করেছেন– যদিও তাঁর আলোচনায় কখনও কখনও উচ্ছ্বাস তথ্যকে ছাপিয়ে গেচে। আমরা যে গবেষক, সংগীতবেত্তা, আলোচকের আধুনিক ও দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কে সহানুভূতিতে ঋদ্ধ রচনা পড়ে কবির গান ও কবিতা সম্পর্কে ধারণা গড়ে নিতে পেরেছি সেই সুধীর চক্রবর্তীর 'দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্মরণ বিস্মরণ' গ্রন্থের বিভিন্ন অংশ থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের মনটি আধুনিক পাঠকের কাছে কীভাবে গৃহীত হয়েছে সেটি বুঝতে পারি। নিভৃতিচর্চায় দ্বিজেন্দ্রলাল অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের মতো একান্ত গুন্ঠনবিলাসী ছিলেন না। সুধীর চক্রবর্তী এই দিকটি খুব স্বচ্ছন্দস্বচ্ছ ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছেন- ''...তাঁর কাব্যকল্পনা রবীন্দ্রগানের মতো অঙ্গবিহীন আলিঙ্গনের অনুভূতির কথা ভাবতেই পারে না সম্ভবত।

বসন্ত যে শুধু ফোটা ফুলের মেলা নয়, তার অন্তরালে যে রয়ে যায় ঝরা পাতারও রিক্তবেদন, দ্বিজেন্দ্রলালের অনুভূতি এতখানি অন্তঃসঞ্চারী নিগূঢ় নয়।"[২] সুধীর চক্রবর্তীর এই প্রসঙ্গে আর-এক সমালোচক ভবতোষ দত্ত-র উক্তি উদ্ধৃত করেছেন 'দ্বিজেন্দ্রলাল ভাবুকতা বিরোধী বস্তুগত কল্পনার কবি।' দ্বিজেন্দ্রলালের এই বাস্তবতা সংলগ্ন কল্পনা-ই বোধ হয় তাঁর সংগীতের রোমান্টিকতাকে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-অনুসারী অতুলপ্রসাদের সংগীত থেকে স্বাতন্ত্র্যময় করেছে। বাঙালির শ্রুতিতে অবশ্য এই স্বাতন্ত্র্য সম্বর্ধিত হয় নি।

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশিগান ও হাসির গান তাঁর রোমান্টিক গান বা সহজ করে বলতে গেলে প্রণয়প্রীতির থেকে বেশিমাত্রায় জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। যদিও আজকাল দু-একটা স্বদেশিগান ছাড়া আর আমরা শুনতে পাই না। তাঁর হাসির গান তারিফ করবার প্রেক্ষিত ও মেজাজ কোনোটাই এইসময়ের মিকটবর্তী নয়। তাই আমরা 'বিলেতফের্তা ক ভাই' বা 'নন্দলাল' হয়তো অন্তর্গত তাৎপর্যের দিক থেকে এখনও বিদেশবিলাসী ও রাজনীতিতে নেতৃত্ব অভিলাষী আমাদের ইচ্ছা - উচ্চাশাকে ঠিকভাবেই উন্মোচিত করে, কিন্তু অনুষঙ্গ ও রেফারেনস্ ঠিক যেন এই সময়ের স্পন্দনকে আর ধরতে পারে না। কিন্তু রোমান্টিক গানের বেলায় তো এমন কথা বলা চলে না। যে মেয়েটি তার আগে আর কল্পনার নিভৃতিটুকু নিয়ে প্রেমিকের জন্যে অপেক্ষায় থাকে অনন্ত তার কল্পনার মালাটিতো। সে সারা সকালটি বসে বসে গাঁথে, অথবা আবেগোৎসারিত ভালোবাসার ছন্দস্পন্দন 'আমরা এমনি এসে ভেসে যাই' এই উচ্চারণে খুব প্রত্যক্ষভাবেই যে ধরা পড়ে তা কি অস্বীকার করা যায়। সেদিন দেবকুমার দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেমের কবিতা নিয়ে বলতে গিয়ে লিখেছিলেন –'প্রেম সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা খুব Practical। তিনি স্বাভাবিক প্রেমকে 'কি যেন কি, রহস্যময়, 'বুঝিনা-বুঝি না' ভাবে দেখিতেন না। প্রেমকেও তিনি যুক্তি দ্বারা বিচার করিয়া যেন 'তন্ন তন্ন করিয়া দেখি- তে চাহিয়াছেন। ...তাঁহার প্রেম রূপজ নহে–প্রায়ই গুণজ।'[৩] দ্বিজেন্দ্রলালের 'আর্য্যগাথা (১ম ভাগ)-র ভূমিকায় কবি লিখেছিলেন, 'যাঁহারা একমাত্র মনুষ্য - প্রেম-গীতিকেই গীত মনে করেন, 'আর্য্যগাথা' তাঁহাদিগের জন্য রচিত হয় নাই।' তিনি প্রকৃতিপ্রেম ও 'দুঃখিনী মাতৃভূমি'র জন্য বেদনা এই গীতিগুচ্ছের বিভাগ হিসাবে মনে করেছেন। সুধীর চক্রবর্তীও ভেবেছিলেন এ একান্ত প্রেমের কবিতা নয়। স্বাদেশিকতাও তাঁর রোমান্টিক ভাবনা - বেদনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। হয়তো, এ কারণেই তাঁর কবিতায় বায়রনের অভিঘাতের কথা পাঠক ভাবতে পারেন। দ্বিজেন্দ্রলাল বায়রনের মুগ্ধ পাঠক ছিলেন– লোকেন পালিত এর মধ্যবর্তিতায় শেলি-কিটসের রসাস্বাদনও করেছিলেন। দেবকুমার -এর গ্রন্থ থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের পত্রাংশ থেকে আমরা পড়ি– 'লোকেনের কাব্য বোঝারও আশ্চর্য্য-অসীম ক্ষমতা। Byron অনায়াস বুঝতে পারেন। shelley প্রভৃতিও জলের মতেই বোঝেন'। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর এই চিঠিতে সংস্কৃত কাব্য, বৈষ্ণবপদাবলীর সঙ্গে শেক্সপিয়র ও শেলি, বায়রন, কিটস পাঠের মধ্যে দিয়ে কবিতার রচনার পক্ষে প্রয়োজনীয় রুচি তৈরি করার উপর জোর দিয়েছেন। দেশের ক্লেশ, একান্ত জাতীয়তার অভিমান থেকে প্রেমকে আলাদা করে, নিগূঢ় এক কল্পনায় আলোছায়াময় দোলাচলে উপলব্ধির সামগ্রীরূপে কাব্য - বিষয়ে পরিণতি দান করে। রোমান্টিক কবিতা ও গান রচনার মন হয়তো আর্য্যগাথা (১ম ভাগ)-য় যে গানগুলি আমরা পাই তার মধ্যে বিচ্ছুরিত হয়নি। তার জন্য আরও দশবৎসর আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল– 'আর্য্যগাথা' (২য় ভাগ)-এর জন্য এবং হাসির গানের চাপাবেদনার অন্য ধরণের আবেগে। 'আর্য্যগাথা'র 'সঙ্গীত' রচনায় কবির আত্ম-উন্মোচক উক্তিতে আমরা পাই।

প্রকৃতি, জননী, আসি প্রতিসন্ধ্যা একবার
তাঁহারি শিক্ষিত গীত গাইব নিকটে তাঁর
সাগর জীবন বন
পিকরাজি সমীরণ
গাইলে নিস্তব্ধ হয়ে শুনিব সে সমস্বর;

তিনি খাঁটি কলাকৈবল্যবাদীর মতোই 'সঙ্গীত'-কে সম্বোধন করে গান রচনা করেছেন–

আপনি মোহিত হব গীতে আপনার।
এস তবে প্রিয়তম সঙ্গীত আমার।

প্রকৃতির বন্দনায়, বিহঙ্গের বিভাবে যেমন তিনি প্রাণিত হয়েছেন তেমনি ভারতমাতা' বা ভারতবাসি' -কে ঘিরে তাঁর আর্ত অন্তরের ভাষাশিল্প রচনা করেছেন, সেখানে তাঁর একান্ত প্রত্যাশা অরুণকিরণে ভারত ভাবিবে। রবিকরে, নিশি হবে নিমগন। পরাধীন ভারতবর্ষে সুন্দরের আরাধনা

তাঁর কাছে বেদনাময় বোধ হয়েছে–

কি কাজ ধ্বনিয়া আজ এ নীরব কারাগার।
চাহিনা শুনিতে বীণা ও মধুর স্বরে আর।।

দেবকুমার চৌধুরী, ভবতোষ দত্ত সুধীর চক্রবর্তী সকলেই উপলব্ধি করেছেন দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেমের গান তাঁর বিবাহিত জীবনের স্নিগ্ধ কোমল অনুরাগভরা দিনগুলিকে ঘিরে সুরবালাদেবীর অনুচ্চারিত সাহচর্যের উৎসরণ। নারীর দাম্পত্যজীবনের দুটোদিকই তিনি 'মন্দ্র' কাব্যগ্রন্থে 'নববধূ' কবিতায় খুব ঘরোয়া অনুরাগে ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে পিতৃগৃহ থেকে অন্য একটি সংসারে আসবার বেদনাকে স্বামীসাহচর্যের আনন্দে কীভাবে পূর্ণ করে তুলেছে এক তরুণী সেটি শেষস্তবকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে...

ক্রমশ দিন চলিয়া গেল সন্দেহ ও ভয়ে,
কাটিয়া গেল ভাবনা-ভীতি নিকট পরিচয়ে;
বুঝিলাম যে আমার পতি, আমরা সখা তিনি,
ভুবন প'রে এমন আর কাহারে নাহি চিনি;
পেয়েছি বটে এমন আর আপন নহে কেহ;
.....
এ দেহ মন দিয়াছি আমি তাঁহার পদে সঁপি,
জীবনে যেন মরণে যেন তাঁহারি নাম জপি।

এই সমর্পিতপ্রাণ দাম্পত্য প্রেম-ই দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেমের গানের আধার। কিন্তু তাঁর পত্নীপ্রেম উপভোগের ভাগ্য ছিলনা। ষোলো বছরের দাম্পত্য জীবনের পর সুরবালা দেবীর আকস্মিক প্রয়াণ তঁঅর জন্য রেখে গেল বিবিক্ত, নিষ্প্রেম ও সুরাসক্তিতে অশ্রুগোপনের বাইরে জীবন। দেবকুমার তাঁর প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য থেকে লিখছেন–

'প্রেমের সেই যে অতুল বর্ষ ক-টি! ষোড়শবর্ষব্যাপী দাম্পত্যজীবনের এই আনন্দময় অবসরেই তাঁহার হাস্যোজ্জ্বল, স্বপ্ন - মোহময় যাবতীয় সঙ্গীত, প্রহসন, কবিতা, নাট্য - কাব্যাদি প্রণীত ও প্রকাশিত হইয়াছিল।...কিন্তু হায়!–নির্মম নিয়তির কুলিশ-কঠোর বিধানে এই অভিন্ন হৃদয় দম্পতির অদৃষ্টে 'এত সুখ সহিল না! অতর্কিত আঘাতে দ্বিজেন্দ্রলালের সকল সুখ-স্বপ্নের অবসান হইয়া গেল।'[৪] ষোলো বছরের যে 'স্পপ্নমোহময়' সময়ের কথা দেবকুমার লিখেছেন সেই সময়ে আমরা পেয়েছি 'গৌরী' কাওয়ালি-তে 'কে দাঁড়াইবে কাছে এসে কুসুমের রাণী'-র মতো গানের পঙ্‌ক্তি। ঝাঁপতালে ছায়ানটে তিনি বেঁধেছিলেন – 'কেন লো পরাণ মম সদা তোমাকে চায়/ সিন্ধু পানে নদী সম তোর পানে সদা ধায়।' অনেক গায়কের মুখে যেমন বিজয় মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে এই গানটি অনেকে শুনেছেন। তাঁর 'আয় রে বসন্ত ও তোর / কিরণ-মাখা পাখা তুলে।/ নিয়ে আয় তোর কোকিল পাখীর/ গানের পাতা গানের ফুলে'-র মতো গান। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের এই গানটি একসময় রঙ্গমঞ্চ মথিত করেছে। আবার 'ভীষ্ম' নাটকে 'আইল ঋতুরাজ সজনী'র মতো মোটামুটি চেনা গানে দ্বিজেন্দ্রলাল যখন এই আবেগটি 'সিন্ধুড়া'য় শ্রোতাদের মর্মে পৌঁছে দিলেন– করিগে চল কুসুমচয়ন, রচিরে চল পুষ্পশয়ন/ ফিরিবে তব নাথ সজনি, হৃদয়ে তব আর্জি তখন প্রণয়ব্যাকুলতার রঙিন প্রহরপুঞ্জ যেন ধরা দেয়। 'সাজাহান' নাটকে পিয়ারার মুখ দিয়ে কবি গাওয়ান 'আমি সারা সকালটি বসে' বসে' এই/ সাধের মালাটি গেঁথেছি।/ আমি পরাব বলিয়ে তোমারি গলায়/ মালাটি আমার গেঁথেছি।' দেবকুমার ভেবেছিলেন কর্মব্যস্ত দ্বিজেন্দ্রলালের বেলাশেষে বাড়ি ফেরার জন্য অপেক্ষমান সুরবালার মনের কথাটি যেন এই গানের ভিতর দিয়ে বেজে উঠেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের জীববিকার রৌদ্ররূঢ় প্রহরশেষে প্রত্যাবর্তনের পর সুরবালা যেন তাঁরই ভাবে - ভাষায় বলে উঠতে পারতেন 'ধর, গলে ফুলহার, মালাটি তোমার, / তোমারই কারণে গেঁথেছি।'

দেশি-বিদেশি সুরে, টপ্ -খেয়ালের ঢৌলে যিনি গান বেঁধেছিলেন হয়তো দেশাত্মবোধের প্রাণনায়, আত্ম-বীক্ষণের প্রয়োজনে হাস্যরস সৃষ্টিতে তাঁর প্রণয়েরও গানেও আবেগের তীব্রতা, বেদনাঘন শূন্যতা শোনা যায়। বেদনার সেই শমিত প্রস্বরটি শোনা যায় যখন তাঁর স্বভাবের থেকে ঈষৎ সরে এসে তিনি লেখেন–

বেলা বয়ে যায়–
ছোট্ট মোদের পানসী-তরী
সঙ্গেতে কে যাবি আয়।

দিলীপকুমার কিংবা সুধীর চক্রবর্তী অবশ্যই হতাশার সঙ্গে স্বীকার করেছেন তাঁর সঙ্গীতস্বল্পতার কথা। তাঁর গানের যে-দাবি সংগীতপিপাসু উত্তরকাল যে-দিন মেটাতে পারবে সেদিনই সংগীতপ্রাণ দ্বিজেন্দ্রলালের গানের পানসিখানি উঠবে ভ'রে।

উল্লেখ

১. স্মৃতিচারণ। প্রথম আনন্দ সংস্করণ ২০১১।
২. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্মরণ বিস্মরণ? সুধীর চক্রবর্তী। ১৯৮৯
৩. দ্বিজেন্দ্রলাল। দেবকুমার রায়চৌধুরী ১৩৭১
৪. তদেব।

কবির গান, কবিতা ও অন্যান্য মন্তব্যের জন্য দ্বিজেন্দ্ররচনাবলী (প্রথম ও দ্বিতীয়খন্ড) সাহিত্যসংসদ -এর সাহায্য নিয়েছি।
কৃতজ্ঞতা– প্রয়োজনীয় বই-এর জন্য শ্রী তপন ঘোষ
অনুলেখ, দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে যিনি আবার নতুন করে ফিরিয়ে এনেছেন সেই সংগীতবেত্তা, সুগায়ক ও অধ্যাপক ড. সুধীর চক্রবতর্চীকে এই ছোট্ট দীন গদ্যটি নিবেদিত হল।